অন্নপ্রাশন

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

খোকার অবস্থা শেষ রাত হইতে ভালো নয়।

কি যে অসুখ তা-ই কি ভালো করিয়া ঠিক হইল? জন্তিপুরের সদানন্দ নাপিত এসব গ্রামে কবিরাজী করে, ভালো কবিরাজ বলিয়া পসারও আছে। সে বলিয়াছিল, সান্নিপাতিক জ্বর। মহেশ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার একটাকা ভিজিটে রোগী দেখে, সে বলিয়াছিল, ম্যালেরিয়া। মহেশ ডাক্তারকে আনিবার মতো সঙ্গতি থাকিলে এতদিন তাহাকে আনা হইত; কাল বৈকালে যে আনা হইয়াছিল সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে, খোকাক্রমশ খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া খোকার মা কান্নাকাটি করিতে লাগিল, পাড়ার সকলেই মহেশকে আনিবার পরামর্শ দিল, পরিবারের গায়ের একমাত্র সোনার অলঙ্কারমাকড়ি জোড়াটা বাঁধা দিয়া আটটা টাকা কেশব ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ও ভিজিটেইডাক্তারের পাদপদ্মে ঢালিয়াছে। তবুও তো ওষুধের দাম বাকি আছে, নিতান্তকম্পাউন্ডারবাবু এখানে ডাকডোক পান, সেই খাতিরেই টাকা-দুই আন্দাজ ওষুধেরবিলটা এক হপ্তার জন্য বাকি রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

এই তো গেল অবস্থা!

মহেশ ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, কোন আশা নাই। অসুখ আসলে নিউমোনিয়া, এতদিন যা-তা চিকিৎসা হইয়াছে। রাতটা যদি বা কাটে, কাল দুপুরে ক্রাইসিস কাটাইবার সম্ভাবনা কম।

কেশব এ কথা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে জানায় নাই। শেষ রাত্রের দিকে যখন খোকারহিক্কা আরম্ভ হইল, খোকার মা বলিল—ওগো, খোকার হিক্কা উঠেচে, একটু ডাবেরজল দিলে হিক্কাটা সেরে যাবে এখন।

জল দেওয়া হইল, হেঁচকী ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমিবার নামটিও করে না।অতটুকু কচি বালকের সে কি ভীষণ কষ্ট! এক-একবার হেঁচকী তুলিতে তার ক্ষুদ্র দুর্বল বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আর তার কষ্ট দেখা যায় না, তখন কেশবের মনেহইতেছিল, "হে ভগবান! তুমি হয় ওর রোগ সারিয়ে দাও, নয় তো ওকে নাও, তোমার চরণে স্থান দাও, কচি ছেলের এ কষ্ট চোখের ওপর আর দেখতে পারি নে।"

সূর্য উঠিবার পূর্বেই খোকা মারা গেল।

কেশবের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিতেই পাশের বাড়ি হইতে প্রৌঢ় বাঁড়ুয্যে-গিন্নি ছুটিয়াআসিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়ে আসিল। সামনের বাড়ির নববিবাহিতা বধূটিওআসিল। বধূটি বেশ, আজ মাস-দুই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু খোকার অসুখের সময়দুবেলা দেখাশোনা করা, রোগীর কাছে বসিয়া খোকার মাকে স্নানাহারের অবকাশ দেওয়া, নিজের বাড়ি হইতে খাবার করিয়া আনিয়া খোকার মাকে খাওয়ানো—ছেলেমানুষ বৌয়ের কাণ্ড দেখিয়া সবাই অবাক। এখন সে আসিয়া কাঁদিয়া আকুলহইল। বড় নরম মনটা।

দশ মাসের ছেলে মোটে। শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

খোকাকে কাঁথা জড়াইয়া কেশব আগে আগে চলিল, তার সঙ্গে পাড়ার আরওতিন-চারজন লোক। ঘন বাঁশবাগান ও বনের মধ্যে সুঁড়ি-পথ। এত সকালে এখনওবনের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে নাই, হেমন্তের শিশিরসিক্ত লতাপাতা, ঝোপঝাপ হইতেএকটা আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বাহির হইতেছে।

ওপাড়ার সতু বলিল—আর বেশিদূর গিয়ে কি হবে, কি বললো রজনীখুড়ো? এখানেই—

কেশব বলিল—আর একটু চল বিলের ধারে—

বিলের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্যে গর্ত করিয়া কাঁথা-জড়ানো শিশুকে পুঁতিয়া ফেলাহইল। দশ মাসের দিব্যি ফুটফুটে শিশু, কাঁথা হইতে গোলাপ ফুলের মতো ছোটমুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানিতে ছোট্ট একটুখানি হাঁ, মনে হইতেছে যেনঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেশবের কোলেই ছেলে, গর্তের মধ্যে পুঁতিবার সময় সে বলিল—গা এখনও গরম রয়েচে।

রজনী খুড়ো ইহাদের মধ্যে প্রবীণ, তিনি বলিলেন—আহা-হা ওসব ভেব না। সতু, নাও না ওর কোল থেকে, ওর কোলে কি বলে রেখে দিয়েচ?

গর্তে মাটি চাপানো হইল। কেশব অবাক নয়নে গর্তের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিল। ছোট্ট মুঠাবাঁধা হাত দুটি মাটি চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল।

রজনীখুড়ো বলিলেন—চল হে বাবাজী, ওদিকে আর চেও না। সংসার তবে আর বলেচে কেন? আমারও একদিন এমন দিন গিয়েচে, আমার সেই মেয়েটা—জান তোসবই। আজ আবার তোমার মনিব-বাড়ির কাজ, তোমায়ও তো সেখানে থাকতে হবে।দেখ তো, দিন বুঝে আজই—

কাজটা সাঙ্গ হইয়া গেল খুব সকালেই। বাড়ি যখন ইহারা ফিরিল, তখন সবে রৌদ্রউঠিয়াছে।

একটু পরে সান্যাল-বাড়ি হইতে লোক আসিল কেশবকে ডাকিতে। বলিল—আসুনমুহুরী মশায়, বাবু ডাকচেন। তিনি সব শুনেছেন, কাজকর্ম করলে মনটাকে ভুলেথাকবেন, সেই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

আজ সান্যাল-বাড়ীর মেজবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সান্যালেরা গ্রামের জমিদার নাহইলেও খুব সম্পন্ন গৃহস্থ বটে। পয়সাওয়ালা ও বর্ধিষ্ণু। এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিও খুব।তেজারতিতেও ষাট সত্তর হাজার টাকা খাটে। পাশাপাশি আট-দশখানা গ্রামে এমন চাষীপ্রায় নাই, যে সান্যালদের কাছে হাত পাতে নাই।

কেশব বলিল, চল যাচ্ছি, ইয়ে...বাড়িতে একটু শান্ত করে যাই। মেয়েমানুষ, বড্ডকান্নাকাটি করচে।

সান্যালেরা লোক খুব ভাল। বৃদ্ধ সান্যাল মশায় কেশবকে দেখিয়া বলিলেন, আরে এস, এস কেশব। আহা, শুনলাম সবই। তা কি করবে বল। ও দেবকুমার, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল, কি রূপ, তোমার অদৃষ্টে থাকবে কেন?যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গিয়েচে। তা ও আর ভেব না, কাজকর্মে থাক, তবুও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে। দেখগিয়ে বাড়ির মধ্যে, ভাতের উনুনগুলো কাটা হচ্চে কি না। বৌমাকেও আনতে পাঠাচ্চি, তিনিও এসে দেখাশুনো করুন, কাজের বাড়ি ব্যস্ত থাকবেন।

মোটরে করিয়া একদল মেয়ে-পুরুষ কুটুম্ব আসিল।

শহরের লোক। মেয়েদের গহনার বাহার নাই, সে সব বালাই উঠিয়া গিয়াছে, শাড়ির রঙচঙে চোখ ধাঁধিয়া গেল। মেয়েরা ঠিকই কলিকাতার চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এ সব পাড়াগাঁয়ের শহরে পুরুষদের বেশভূষা নিজের নিজের ইচ্ছামত—ধুতির সঙ্গে কোট পরা এখানকার নিয়ম, কেউ তাতে কিছু মনে করে না।

চারিধারে হাসিখুশি, উৎসবের ধুম। কেশবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড বড় ফাঁক, এদের হাসিখুশির সঙ্গে তার মিল খাইতেছে না। আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউই বোধ হয় জানে না, তার আজ সকালে কি হইয়া গিয়াছে...

একটি ভদ্রলোক চার বছরের একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন।বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, গায়ে রাঙা সিল্কের জামা, কোঁচানো ধুতি পরনে এতটুকু ছেলের, পায়ে রাঙা মখমলের উপর জরির কাজ করা জুতো। কি সুন্দর মানাইয়াছে!

কেশবের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকটিকে বলে— শুনুন মশায়, আমারও একটি ছেলে ছিল, অবিকল এমনিটি দেখতে। আজ সকালে মারা গেল। আপনার ছেলের মতোই তার গায়ের রং।

মহিমপুরের নিকারীরা মাছ আনিয়া ফেলিল। গোমস্তা নবীন সরকার ডাকিয়া বলিল—ওহে কেশব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, চট্ করে মাছগুলোর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে ওদের হাতচিঠেখানা সই করে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই—কাতলাআধ মণের বেশি হলে ফেরত দিও—শুধু রুইয়ের বায়না আছে।

নবীন সরকার জানে না তাহার খোকা আজ সকালে মারা গিয়াছে। কি করিয়া জানিবে, ভিন গাঁয়ের লোক, তাতে এই ব্যস্ত কাজের বাড়িতে; সে খবর তাকে দেওয়ারগরজ কার?

কেশব একবার নবীন সরকারকে গিয়া বলিবে—গোমস্তা মশায়, আমার খোকাটিমারা গিয়েচে আজ সকাল বেলা। ফুটফুটে খোকাটি। বড় কষ্ট দিয়ে গিয়েচে।

নবীন সরকার নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইয়া যাইবে। বল কি কেশব! তোমার ছেলে আজসকালে মারা গিয়েচে, আর তুমি ছুটোছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছ! আহা-হা, তোমারছেলে! আহা, তাই তো!

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেশব তো কাহাকেও কিছু বলিবে না।

মাছ ওজন করিয়া লইবার পরে দুধ-দই আসিয়া উপস্থিত। তারপর আসিল বাজার হইতে হরি ময়রার ছেলে, দু'মণ-আড়াই মণ সন্দেশ ও আড়াই মণ পান্তুয়া লইয়া। দই-সন্দেশ ওজন করিবার হিড়িকে কেশব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সপ বিছানো, সামিয়ানা খাটানো প্রভৃতি কাজ তদারক করিবার ভারও পড়িল তাহার উপর।

ইতিমধ্যে সকলেই সব ভুলিয়া গেল, একটা বড় গ্রাম্য দলাদলির গোলমালের মধ্যে। সকলেই জানিত, আজ হারাণ চক্রবর্তীর বিধবা মেয়ের কথা ও সভায় উঠিবেইউঠিবে। সকলে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। প্রথমে কথাটা তুলিলেন নায়েব মশায়—তারপরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও পরিশেষে ও-পাড়ার কুমার চক্রবর্তী রাগ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কাজের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—অমন দলে আমি থাকি নে!যেখানে একটা বাঁধন নেই, বিচার নেই—সে সমাজ আবার সমাজ? যে খায় খাক, একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি বা আমার বাড়ির কেউ খাবে না—আমার টাকানেই বটে, কিন্তু তেমন বাপের—ইত্যাদি।

তিন-চারজন ছুটিল কুমার চক্রবর্তীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে। কুমার চক্রবর্তী যে একরোখা, চড়ামেজাজের মানুষ সবাই তা জানে। কিন্তু ইহাও জানে যে, সে রাগ তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। নায়েব মশায় বলিলেন—তুমি যেও না হরিখুড়ো—তোমার মুখ ভালো না, আরও চটিয়ে দেবে। কার্তিক যাক, আর শ্যামলালযাক—

হারাণ চক্রবর্তীর যে মেয়েটিকে লইয়া ঘোঁট চলিতেছে, সে মেয়েটি কাজের বাড়িতেপদার্পণ করে নাই।

পাশের বাড়ির গোলার নিচে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, আজই একটামিটিং হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত সামাজিক নিষ্পত্তি কিছু হইবে, তাহা সে জানিত এবং তাহারই ফল কি হয় জানিবার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই নাম কুমারচক্রবর্তীর মুখে ওভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পাঁচিলের ঘুলঘুলি দিয়া দুরু দুরু বক্ষেব্যাপারটা কি দেখিবার চেষ্টা পাইল।

পাঁচিলের ওপাশে নিকটেই কেশবকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল—কাকা ওকাকা—

কেশব কাকাকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে, কেশব কাকার মতো নিপাটভালোমানুষ এ গাঁয়ে দুটি নাই।

আহা, সে শুনিয়াছে যে আজই সকালে কেশব কাকার খোকাটি মারা গিয়াছে, অথচ নিজের দুর্ভাবনায় আজ সকাল হইতে সে এতই ব্যস্ত যে, কাকাদের বাড়ি গিয়া একবার দেখা করিয়া আসিতে পর্যন্ত পারে নাই।

কেশব বলিল—কে ডাকে? কে, বিদ্যুৎ? কি বলচ মা? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হারাণ চক্রবর্তীর মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। খুব সুন্দরী না হইলেও বিদ্যুতের রূপেরচটক আছে সন্দেহ নাই, বয়স এই সবে উনিশ।

বিদ্যুৎ ম্লানমুখে গলার সুমিষ্ট সুরে অনেকখানি খাঁটি মেয়েলী সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—কাকা, খোকামণি নাকি নেই? আমি সব শুনেছি সকালে। কিন্তু কোথাও বেরুতে পারিনি সকাল থেকে, একবার ভেবেছিলুম যাব।

কেশব উত্তর দিতে গিয়া চাহিয়া দেখে বিদ্যুতের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এতক্ষণ এই একটি লোকের নিকট হইতে সে সত্যকার সহানুভূতি পাইল। কেশব একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তা যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস নে—যা। ও ঘোঁটের কথা শুনে আর কি হবে, তুই বাড়ী যা। কুমার চক্কোত্তি রাগারাগি করে চলে গিয়েচে, ওকেসবাই গিয়েচে ফিরিয়ে আনতে। তোর ওপর খুব রাগ কুমারের। তবে ও তো আরসমাজের কর্তা নয়, ওর রাগে কি-ই বা এসে যাবে।

—কি বলছিল ওরা?

—তুই নাকি এখনও গাঙ্গুলী বাড়ি যাস্, তোকে ওদের টিউবকলে জল তুলতেযেতে দেখেছে কুমারের স্ত্রী। কোন্‌দিন নাকি ওদের নারকোল তলায়—ইয়ে, সুশীলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলি, তাও কুমারের স্ত্রী দেখেছে—এই সব কথা।

বিদ্যুৎ বলিল—আমি যাইনি কাকা, সেবার সেই বারণ করে দেওয়ার পর থেকে আর কখনো যাইনি।

এ কথাটি বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিল। সুশীলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা হইতেই আলাপ। সুশীল যখন কলেজে পড়িত, তখন বিদ্যুৎ বারো তেরো বছরের মেয়ে। সুশীলদা'রদেখা পাইলে তখন হইতেই সে আর কোথাও যাইতে চায় না।

সুশীলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাহারা বৈদিকআর সুশীলেরা রাঢ়ীশ্রেণী। বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল পাশের গ্রামের শ্রীগোপালআচার্যের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বিধবা হইয়াছে বিবাহের দু'বছর পরেই। শ্বশুরবাড়ি মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ এখানেই থাকে। সুশীলের সঙ্গে তাহার ছেলেবেলার মাখামাখিলইয়া একটা অপবাদ গ্রামের মাঝে রটিয়াছিল। এই অপবাদের দরুনই তাহারা এখনগ্রামে একঘরে হইয়া আছে, এ বাড়িতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঝুমুর গানের দল আসিয়া হাজির হইল। সামিয়ানার একধারে ইহাদেরজন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা, দল আসিতেই সেখানে গিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিল। কেশব ছুটিয়া গেল গোলমালথামাইতে। দলের অধিকারী বলিল—ও সরকার মশাই, আমাদের একটু তামাক-টামাকের যোগাড় করে দিন, আর দু-পাঁচ-খিলি পান। রোদ্দুরে বামুনগাঁতির বিল পারহতে যা নাকালটা হয়েচি সবাই মিলে!

বেলা বারোটার সময় কেশব একবার বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। স্ত্রীর জন্য তাহার মনটাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, বেচারী এ বাড়ি আসিয়াছে তো,—না খালি বাড়িতে একাপড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে?

না, দেখিয়া আশ্বস্ত হইল স্ত্রী আসিয়াছে ও ইঁদারার পাড়ে একরাশ পুরোনো বাসনঝিয়ের সঙ্গে বসিয়া মাজিতেছে, তাহাদের আজ মরণাশৌচ, বাহিরের কাজকর্ম ছাড়াঅন্য কাজ করিবার জো নাই।

মেজবাবুর যে-খোকার অন্নপ্রশান, দালানে খাটের উপর সুন্দর বিছানাতে চারিদিকেউঁচু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ন' মাসের হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি শিশু, গায়ে একগা গহনা, সামনের গদীতে একখানা থালে যেসব বিভিন্ন অলঙ্কারআত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে দিয়াছে, সেগুলি সাজানো। তিন-চার ছড়া হার, সোনারঝিনুক, পদক, তাগা, বালা, রূপার কাজললতা। চারিধারে ঘিরিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়াআছে, ইহারা কেউ কেউ এ গ্রামের বৌ-ঝি, কিন্তু বেশির ভাগই নবাগতা কুটুম্বিনীরদল। সকাল হইতে বেলা এগারোটা পর্যন্ত আপ ডাউন যে তিনখানা ট্রেন যায়, প্রত্যেক ট্রেনের সময়ে দু'তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া ইহারা কোন দল কলিকাতা হইতে, কোন দল বা রাণাঘাট, কি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, কি শান্তিপুর হইতে আসিয়াছে। শহরের মেয়ে, কি সব গহনা ও শাড়ির বাহার, কি রূপ, কি মুখশ্রী, যেন এক একজন এক একখানিছবি!

খোকাটি কেমন চমৎকার হাসিতেছে। কেমন সুন্দর মানাইয়াছে ওই বেগুনী রংয়েরজামাটাতে! তাহারা খোকারও অন্নপ্রাশন দিবার কথা ছিল এই মাসে।

গরিবের সংসার, খোকার যখন চার মাস বয়স, তখন হইতে ধীরে ধীরে সবজোগাড় করা হইতেছিল। কাপালীরা মুসুরি ও ছোলা দিয়াছিল প্রায় আধ মণ, নাড়ুর চালের জন্য ধান জোগাড় করা হইয়াছিল, সাত-আটখানা খেজুরের গুড় দিয়াছিলবাগদীপাড়ার সকলে মিলিয়া। বৃদ্ধ ভুবন মণ্ডল বলিয়াছিল—মুহুরী মশায়, যত তরিতরকারি দরকার হবে, আমার ক্ষেত থেকে নিয়ে যাবেন খোকার ভাতের সময়, একপয়সা দিতে হবে না। কেবল বামুন-বাড়ির দুটো পেরসাদ যেন পাই। শূদ্র-ভদ্র সবাইখোকাকে ভালবাসিত।

মেজবাবুর খোকার গায়ের রং অনেক কালো তার খোকার তুলনায়। মেজবাবু নিজে কালো, খোকার খুব ফরসা হইবার কথাও নয়। সুতরাং এদের মানানো শুধু জামায় গহনায়। তাহার খোকা গরিবের ঘরে আসিয়াছিল। এক জোড়া রূপার মল ছাড়াআর কোনকিছু খোকার গায়ে উঠে নাই।

আজ শেষ রাত্রে খোকার সেই হেঁচকীর কষ্টে কাতর কচি মুখখানি, অবাক দৃষ্টিনিষ্পাপ, কাচের চোখের মতো নির্মল ব্যথাক্লিষ্ট চোখদুটি...আহা, মানিক রে!

—ও কেশব, বলি হ্যাদ্দেশ্যে এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে! বেশ লোকযা হোক। ব্রাহ্মণদের পাতা করবার সময় হল, সামিয়ানা খাটাবার ব্যবস্থা কর গে। আমিতোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চোদ্দভুবন, আর তুমি এখানে, বেশ নম্বুরী নোটখানি বাবা! পা চালিয়ে দেখ গিয়ে—

নবীন সরকার।

কিন্তু নবীন সরকার তো জানে না...

সে কি একবার বলিবে...?—ও গোমস্তা মশায়, এই আমার খোকা আজ সকালে... ও রকম করে আমায় ডাকবেন না...আমার মনটা আজ ভাল না...

দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে নানা গ্রাম হইতে।এগারোখানা গাঁ লইয়া সমাজ, সমাজের সকলেই নিমন্ত্রিত। বড় বৈঠকখানায় লোক ধরিল না, শেষে লিচুতলায় প্রকাণ্ড শতরঞ্জ পাতিয়া দেওয়া হইল। আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেউলে সরাবপুরের বরদা বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারাণ চক্কোত্তি সমাজে একঘরে, তাদের বাড়ির কারুর কি নেমন্তন্নহয়েচে আজ কাজের বাড়িতে? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ির কেউ যদি এ বাড়িতেআজ এসে থাকেন, তবে আমি অন্তত দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকেবলচি যে, আমরা এখানে কেউ জলস্পর্শ করব না।

আরও দু'পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা সমস্বরে এ কথা সমর্থন করিল। অনেকেআবার হারাণ চক্রবর্তীর আসল ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। ছেলে-ছোকরার দল নাবুঝিয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

এ বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা সান্যাল মশায়ের ডাক পড়িল। তিনি কাজের বাড়িতে কোথাওব্যস্ত ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গাঁয়ের সমাজ বড়গোলমেলে, তাহা তিনি জানিতেন। পানহইতে চুন খসিলেই এই তিনশ' নিমন্ত্রিতব্রাহ্মণ এখনই হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিবে, খাইব না বলিয়া শুভকার্য পণ্ড করিয়া দিয়া বাড়ীচলিয়া যাইবে। প্রাচীন, বিচক্ষণ ব্যক্তি সব, কিন্তু সামাজিক ঘোঁটের ব্যাপারে ইহাদের না আছে বিচার-বুদ্ধি, না আছে কাণ্ডজ্ঞান।

তবুও সান্যাল মশায় সভার মধ্যে খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আপনাদের সকলকেই জানাচ্চি যে হারাণ চক্কোত্তির বাড়ির একটি প্রাণীও আমার বাড়ি নিমন্ত্রিত নয়, তাঁদের কেউ এ বাড়ীতে আসেনওনি! কিন্তু, আমার আজ অনুরোধ, এইসভাতেই সে ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। হারাণ আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। তার ছেলে-মেয়ে আমার নাতি-নাতনীর বয়সী। আজ আমার বাড়ীর কাজ, আর তারা মুখ চুন করে বাড়ি বসে থাকবে, এ বাড়িতে আসতে পারবে না, খুদ-কুঁড়ো যা দুটো রান্না হয়েচে তা মুখে দিতে পারবে না, এতে আমারমন ভালো নেয় না। আপনারা বিচার করুন তার কি দোষ—আমাদের গাঁয়ের লোকমিলে আজ সকালে একটা মিটিং আমরা এ নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সকলে উপস্থিত নাহলে ব্যাপারটা উত্থাপন করা ভালো নয় বলে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার যদি মত শোনেন, আমি বলি হারাণ চক্কোত্তির মেয়ে নির্দোষ, তাকে সমাজে নিতে দোষ নেই।

ইহার পর ঘণ্টা-দুই ব্যাপী তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইল, আজ সকাল বেলার মতোই।এই সভায় সবাই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাই। চড়া গলায় সকলেই কথা বলে, কথার মধ্যেযুক্তিতর্কের বালাই নাই। দেখা গেল, এ গাঁয়ের হারাণ চক্রবর্তীর ব্যাপার লইয়া দুটোদল, একদল তাহাকে ও তাহার মেয়েকে একঘরে করিয়া রাখিবার পক্ষে মত দিল।অপর পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে। হারাণ চক্রবর্তীর ডাক পড়িল, তাঁর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, কিন্তু কানে

একেবারে শুনিতে পান না। টাইফয়েড হইয়া অল্প বয়স হইতেই কান দুটি গিয়াছে। তিনি হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, তাঁহার মেয়েকে তিনি ভালো রকমই জানেন, তার স্বভাব-চরিত্র সৎ। যে ছেলেটিকে লইয়া এ কথা উঠিয়াছে, গাঙ্গুলীবাড়ির সেই ছেলেটি কলেজের পাস, উঁচু নজরে কাহারও দিকে চায় না। ছেলেবেলাহইতেই বিদ্যুতের সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো মেলামেশা, এর মধ্যে কেউ যে কিছুদোষ ধরিতে পার— ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বিরুদ্ধ দলের কর্তা কুমার চক্রবর্তী রাগিয়া উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহা আমাদের মনে আছে, কিন্তু সে সব কথা পাড়াগাঁয়ের দলাদলি—সভায় উচ্চারিত হইতে পারিলেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়।

অনেক করিয়াও হারাণ চক্রবর্তীর হিতাকাঙ্ক্ষী দল কিছু করিতে পারিল না। কুমারচক্রবর্তীর দলই প্রবল হইল। আসলে বিদ্যুৎ যে খুব ভালো মেয়ে, বিদ্যুতের মনটি বড়নরম, পাড়ার আপদ-বিপদে ডাকিলেই ছুটিয়া আসে এবং বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করে, তাহার উপর সে ছেলেমানুষ, এখনও তত বুঝিবার বয়স হয় নাই, বৃদ্ধের দলের আসল যুক্তি এই। কিন্তু এ সত্য কথা সভায় দাঁড়াইয়া বলা যায় না।

কুমার চক্রবর্তীর দলের লোকেরা বলিল—সেবার সুরেনের মেয়ের বিয়ের সময় আমরা তো বলে দিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ সুশীলদের বাড়ি যাতায়াত বা সুশীলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করুক। এক বছর আমরা যদি দেখি, সে আমাদের কথা মেনে চলেচে, তবে আমরা তাদের দলে তুলে নেব—কিন্তু সে কি তা শুনেচে?

হারাণ চক্রবর্তী বলিলেন—কৈ কে দেখেচে—বলুক কবে আমার মেয়ে এই একবছরের মধ্যে—

কিন্তু এমন ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে দেখিবার লোকের অভাব হয় না।

দেখিয়াছে বৈ কি! বহু লোক দেখিয়াছে। পরের বাড়ি কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য যাহারা ওত পাতিয়া থাকে, তাদের চোখে অত সহজে ধূলা দেওয়া চলে না।

অবশেষে কে বলিল—আচ্ছা, কাউকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হোক না—সে যদি আমাদের সামনে স্বীকার করে, সে ওখানে যাতায়াত করে এবং সঙ্গেসঙ্গে ঘাট স্বীকার করে, কথা দেয়, আর কখনও এ কাজ সে করবে না, তবে না হয়—

বিদ্যুৎ পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

কেশব গিয়া বলিল—মা আছিস? রাজী হয়ে যা না, ওরা যা যা বলচে। কেন মিছে মিছে—

বিদ্যুৎ কাঁদিয়া বলিল—আপনি ওদের বলুন আমি সব তাতে রাজী আছি কাকা।

সভার মধ্যে বাপকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া লজ্জায়, দুঃখে সে মরিয়া যাইতেছিল...তার জন্যই তার নিরীহ পিতার এ দুর্দশা...তা ছাড়া তার দাদা শ্রীগোপালের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আজ পাঁচ-ছ'দিন হইতে যজ্ঞিবাড়ির নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে অধীর হইয়াআছে, ছেলেমানুষ তারা কি বোঝে—অথচ আজ তাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এবাড়িতেআসিতে না পাইয়া মুখ চুন করিয়া বেড়াইতেছে—ইহা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা, ওদের বালি থেকেডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেছ খাব, না, পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—

তার মা ধমক দিয়া থামাইয়া রাখিয়াছে—থাম, এখন চুপ কর্। যখন যাবি তখনযাবি। তা না এখন থেকে—এখন বরং একটু ঘুমো দিকি। ঘুমিয়ে উঠে আমরা সেইবিকেলে তখন সবাই যাব।

ঘরে বাহিরে বিদ্যুতের আর মুখ দেখাইবার জো নাই।

কিন্তু কেশবের কথায় কি হইবে। এক আধটি বাজে লোকের প্রস্তাবেই বা কি হইবে। বরদা বাঁড়ুয্যে ও কুমার চক্রবর্তী এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। একবার যে শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আর শর্ত করিয়া

ফল নাই। আর এ শর্তের ব্যাপার নয়।একটা স্ত্রীলোককে সামাজিক শাসন করা হইতেছে, ইহার মধ্যে শর্তই বা কিসের? মাথামুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া যে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই এতদিন, ইহাই যথেষ্ট।

সুতরাং হারাণ চক্রবর্তী যেমন একঘরে ছিলেন, তেমনই রহিয়া গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা। কেশবের মরণাশৌচ, সে পরিবেশন করিবে না, ভিখারী বিদায়ের ভার পড়িল তার উপর। দু-তিন দফা ব্রাহ্মণ খাওয়ানো ও ভিখারীবিদায় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে শূদ্রভোজন, সে চলিল রাত দশটা পর্যন্ত।

কেশব সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন খাইতে বসিল, তখন রাত এগারোটা।আয়োজন ভালই হইয়াছিল, কিন্তু এত রাত্রে জিনিসপত্র বেশি কিছু ছিল না। কেবলদই ও মিষ্টি এবং দু'তিন রকমের টক তরকারি দিয়া কেশব পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুইজনেরআহার একা করিল। পরে স্ত্রীকে লইয়া অন্ধকারেই নিজের বাড়ি রওনা হইল।

কেশবের স্ত্রীও খুব খাইয়াছে। কেশবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তা গিন্নীর বড়মেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে। নিজের হাতে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে গেল। খুব যত্ন করেচে। রান্নাবান্না কি চমৎকার হয়েচে, না?

কেশব বলিল—তা বড়লোকের ব্যাপার, চমৎকার হবে না? নয় তো এমনঅসময়ে কপি কোথা থেকে এই পাড়াগাঁয়ে আসে বল দিকি? পেয়েছিলে কপিরতরকারি?

—তা আর পাইনি? দু-দুবার দিয়েছে আমার পাতে। হ্যাঁগা, এখন কপি কোত্থেকেআনালে? কলকাতায় কি বারমাস কপি মেলে?

বাড়ির উঠানে তুলসীতলায় একটা মাটির প্রদীপ তখনও টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে।কেশবের স্ত্রী বলিল—ও-বাড়ির ছোট-বৌ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েচে, আহা বড় ভালোমেয়ে। আজ সকালে কেঁদে একেবারে আকুল।

সকালে যে ভাবে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঘরবাড়ি সেই ভাবেই পড়িয়াআছে। কারো সাড়া-শব্দ নাই,—নির্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িখানা খাঁ-খাঁ করিতেছে। আশেপাশেঘন অন্ধকার, কেবল তুলসীতলায় ওই মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোটুকু ছাড়া।

কেশব শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেশব স্বপ্ন দেখিতেছিল, বিদ্যুৎ আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিতেছে কাকা, আজই বুঝি...একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু যে দুর্ভাবনা আমার ওপর দিয়ে আজ সারাদিন...

বাহিরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানায়উঠিয়া বসিল—সর্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়া রোগী, বাঁশতলায় তার ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে! ...পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরটুকু ছুটিয়াযাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভাবিল—আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল...হঠাৎ দেখিল সে কাঁদিতেছে, অঝোর ধারে কাঁদিতেছে...বাহিরে ঐ বৃষ্টিধারার মতো অঝোর ধারে...বার বার তার মনে হইতে লাগিল—তখনও ওর গা গরম ছিল...বেশ গরম ছিল...